***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
**UGC Approved, Journal No: 48666**
*Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 63-70*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ভাবনার আলোকে ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত

## ড. কৃষ্ণ ধীবর

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, কলকাতা*

***Abstract***

*Vedanta is the last part of the Vedas. Many times many of the Vedanta explains. All explanations are in need of the era. During the 19th century, two persons explained the Vedanta their own perspective. One of them is Rabindranath Tagore and the other was Swami Vivekananda. Swami Vivekananda followed the explanation of Shankaracharya. According to him the lie only Brahman is the reality. So the goal of life is to worship God. According to Vivekananda Brahman is the goal in the life. On the other hand, Rabindranath Tagore was a poet. The does not seem to lie to the world. So the poet brings joy into the world. According to the poet man is god. I wanted to show in this paper Brahman of the vadanta how useful in each life. Rabindranath explains the Vedanta with elements of the world . But Vivekananda says that Brahman nothing outside of god. So Vedanta explains of both is different. However, both explains the phenomena of Vedanta.*

***Keynote Address: Vedanta, God, Brahman, Life, Goal.***

*"তরতি শোকং তরতি পাপমানং*
*গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"*[1]

মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কোলাহলশূন্য শান্তিময় জীবন, যে জীবন, জটিল মানসিকতায় ভারাক্রান্ত নয়, বা নিরানন্দের কারাগারে যে জীবন বন্দী নয়। কিন্তু সেই জীবনের বাস্তবতা আজ কোথায়? মানুষ আজ সত্যই শান্তির ভিখারি। বিশ্বাসের ভিত আজ এতোই ঠুনকো যে সদ্যজাত শিশুও সমাজকে বিশ্বাস করতে ভয় পায়। প্রকৃতির উপাদানও যেন বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্রে দীক্ষিত। জীবনের চেনা অভিজ্ঞতাও যেন হার মেনে যায় বর্তমানের জটিল মানসিকতার কাছে। কিন্তু কেন এমন দুরবস্থা? সভ্যতার উন্নতির চরম শিখরে দাঁড়িয়েও মানুষ কেন আজ না পাওয়ার বেদনায় হাহাকার করে? সঠিক উত্তর হয়তো আমাদের কাছে নেই , কিন্তু সমাধানের সূত্র হয়তো আমাদের জীবন পরিচালনার কৌশলেই নিহিত। জীবনের প্রতিটি সৎচিন্তাকে প্রায়োগিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে হয়তো অপমৃত্যু এড়ানো যাবে। হয়তো বা স্বাধীন চেতনায় জীবন ছাড়পত্র পাবে। সেদিন ঋষি অনুভূতিতে জীবনরহস্যের যে সূত্র ধরা পড়েছিল, তা বর্তমান বেদনাক্লিষ্ট সমাজকে হয়তো বা শান্তির রাজ্যে বিচরণ করাতে পারে।

[1] মুণ্ডকোপনিষদ্-৩/২/৯

অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশে শঙ্করাচার্য বেদান্তকে জীবনমুখী করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বেদান্ত-সাধকদের সাধনায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতকে একদিকে রক্ষণশীল সমাজ ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মাঝখানে দুই সাধকের ব্যাবহারিক বেদান্তসাধনা প্রখর যুক্তিবাদের পথ দেখিয়েছিল। বেদান্তের যুক্তিশীল তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাকে কর্মের সাথে যুক্ত করে তাঁরা বেদান্তকে প্রায়োগিকরূপে প্রতিফলিত করেন। তাঁদের বেদান্তের এই প্রায়োগিকরূপই ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত নামে পরিচিত।

কর্মজীবনে বেদান্ত বা ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগে - হাজার হাজার বছর পূর্বে বৈদিক ভাবনাপ্রসূত উচ্চতম তত্ত্বকে বর্তমান কোলাহলময় কর্মজীবনে ব্যাবহারিক রূপ দেওয়া কীভাবে সম্ভব? অথবা প্রশ্ন জাগে, বেদান্তচর্চার অধিকারী কে বা কারা? শঙ্করাচার্যের মতানুসারে সাধনচতুষ্ঠয় সম্পন্ন সন্ন্যাসীর বেদান্ত পাঠের যেমন মুখ্য অধিকার রয়েছে, তেমনি বেদান্ত চর্চায় গৃহস্থাদিরও গৌণ অধিকারও স্বীকৃত। বিবেকানন্দের ভাবনায় বলা যায়-

> *"বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ঠ অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-ব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না।"*[2]

আবার বর্তমান কোলাহলময় পরিবেশে তথা কর্মজীবনে বেদান্তচিন্তার প্রয়োগ সম্ভব কিনা তার ইঙ্গিত মহাভারতের গীতায় স্পষ্ট। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কোলাহলের মধ্যেও অর্জুন উচ্চমার্গের বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণ করেছেন এবং তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ করেছেন। স্বামীজির ভাষায় –

> *"আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে- তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চির শান্তভাব। এই তত্ত্বকে 'কর্মরহস্য' বলা হইয়াছে। এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য।"*[3]

কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুনের চেয়ে আমাদের জীবনের কর্ম-ব্যস্ততা বোধহয় অনেক কম। সুতরাং বেদান্তের অনুশীলন স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা মননঋদ্ধ সাধনার ফসল।

বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বা 'ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত' তত্ত্বটি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয় উভয়ের অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে। একজন বেদান্তকে জীবনের সাথে জড়িয়ে অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন, প্রকৃতির খেলা তাঁর কাছে মায়ার খেলা। খণ্ডটা তাঁর কাছে মায়ায় বাঁধন, সম্ভোগ নয়, ত্যাগই জীবনের পরম আদর্শ। জগৎস্রষ্টার নিমিত্তে জীবনের মহৎ কর্মকে বিলিয়ে দিয়ে যিনি সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন, তিনিই আবার খণ্ডবোধের মধ্য দিয়ে অখণ্ডবোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই উত্তরণের চাবিকাঠি প্রেম, প্রেমই জীবনের বিরুদ্ধ সত্তাকে ধ্বংস করে অখণ্ডতত্ত্বের মাধ্যমে ধর্মে উত্তীর্ণ করে। তাই তিনি বললেন-

> *"বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন।"*[4]

---

[2] স্বামীজির বাণী ও রচনা(দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৬৮

[3] তদেব- ১৬৮

[4] স্বামীজির বাণী ও রচনা(দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৬৭

অপরদিকে প্রকৃতির দূত রবীন্দ্রনাথ অখণ্ডবোধকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। রূপ-রস-গন্ধে ভরা জগতই তাঁর কাছে লীলার উপাদান। সুর আর ছন্দের ঝংকারে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর অনুভূতি, তাই তিনি বললেন-

> *"আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ। এই যিনি অদ্বৈতং তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া। - আত্মবৎ সর্বভুতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"*[5]

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবের জগৎকে সামনে রেখে যে চরম সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, তা তিনি বিচার করেছেন বেদান্তের মাপকাঠিতে। সেই চরম সত্যের সমর্থন তিনি খুঁজেছেন উপনিষদের মন্ত্রে। আর তার প্রতিফলন ঘটেছে তারই লেখা কাগজকুচির পাতায়। কখনো কবিতা, কখনো গান, কখনো প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস, কখনো বা ব্যক্তিগত জীবনানুশীলনের মধ্য দিয়ে। কবির দার্শনিক চিন্তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর দর্শন চিন্তা কোন তত্ত্বকথা নয় ব্যাবহারিক জীবনেরই প্রতিফলিত রূপ। ঔপনিষদিক ভাবরসে সিক্ত কবি জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তার জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে।

সুতরাং রবীন্দ্রচিন্তনে সমগ্র জগৎ হল ব্রহ্ম স্বরূপ, আর এই একই সুর বিবেকমননেও ধ্বনিত হয়। অদ্বৈতপিপাসু সন্ন্যাসীর কাছে জগৎ আর জীবের মূল্য আলাদা, 'আমি' তার কাছে অনেক বড়ো, 'আমি'-র সীমাতেই তিনি অসীমকে খুঁজেছেন। ব্রহ্ম তাঁর কাছে পৃথক কোন সত্তা নয়, 'আমি'র গহনে লুকিয়ে থাকা অনুভূতি। যে অনুভূতি জাগ্রত হয় "জীব জ্ঞানে শিব সেবা"র পূর্ণ বিকাশে। তাই নিজেকে বিলিয়ে জগৎকে চেনার মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অপরিপক্ক অবস্থায় রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন - "ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম? এটা কেমন করে সম্ভব? ঠাকুর উত্তরে বললেন - হ্যাঁ জগতের সবকিছুই ব্রহ্মা! পরে এটা বুঝতে পারবি।"[6] স্বামীজি পরবর্তী জীবনে বেদান্তের এই অনুভুতিকেই ব্যাবহারিক জীবনে রূপ দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ব্যাবহারিক বেদান্ত খুবই গুরত্বপুর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাবহারিক বেদান্তের অন্যতম প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। তিনি জীবনের প্রাক্‌লগ্ন থেকেই বর্ণাশ্রমের প্রশংসা করলেও জাতিভেদের উপর নিদ্রার কষাঘাত করেন, কবির মতে জীবনে গার্হস্থে প্রবেশ করে ভোগবিলাসের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি ব্রহ্মচর্যে সন্ন্যাসী ন্যায় বৈদান্তিক অনুভূতিরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই কবি বললেন- *"আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই।"*[7]

আবার জাতি, ধর্ম, বর্ণের সবিশেষ উদারতা বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগকে সার্থক করে, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত খোলা শান্তিনিকেতন একদিকে ব্রহ্মচর্যের বিজয়কেতন উড্ডীন করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বেদান্তের অখণ্ডবোধকে বিশ্ববোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, এ যেন ফলিত বেদান্তেরই বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া শিক্ষা শুধু বাহ্যিক রূপ নয়, অন্তরের মূল্যবান অনুভূতি, তাই অন্তঃরাজ্যের চেতনার বিকাশের দ্বারা বিশ্বমানবতাবোধকে জাগ্রত করবার ডাক দিয়েছিলেন বেদান্তপিপাসু সন্ন্যাসীও এবং বেদান্তের অদ্বৈতভাবনাকে বাস্তবে রূপ দান করতে বেলুড় মঠ ও অদ্বৈতআশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামীজি। তিনি চেয়েছিলেন বেদান্তের তত্ত্ব

---

[5] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তং শিবমৈদ্বতম্, ধর্ম, পৃ. ১১৯

[6] দ্রঃ প্রমথনাথ বসু,স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ), পৃ.৯৯

[7] আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা, পৃ. ২৪৮

জীবনের সকল অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ুক। উপনিষদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"[8] বাণীতে জাগরিত হোক অন্তরসত্ত্বা, তাই সন্ন্যাসীর উপদেশ –

> *"ওঠ, জাগো হে মহান, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিও না। হে সর্বশক্তিমান ওঠ, জাগো ; স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি নিজেকে পাপী বলিয়া মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তুমি নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাব, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। .....মনুষ্যজাতিকে ঐ কথা বলিতে থাক—তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই দৈনন্দিন জীবনে ইহা অনুশীলন করিতে শিখিব।"*[9]

সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ একই, মায়া বা অজ্ঞানের জন্য ভেদস্বরূপ দৃষ্ট হয়। তাছাড়া হিংসা, দ্বেষ, অহংকার জীবকে ব্রহ্মের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেয় না, সুতরাং নিজেকে অজ্ঞান থেকে বের করে এনে বিশ্ব মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই বেদান্তের প্রয়োগিক রূপকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর এটা সম্ভব নিষ্কাম কর্মের উপাসনার মধ্য দিয়ে। আর নিষ্কাম কর্মে জীব তখনই নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারবে যখন ফলের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মাবে। প্রশ্ন ওঠে কর্ম তো ফলের অপেক্ষাতেই, তাহলে কর্মফল চাওয়া কি অন্যায়? বেদান্তে ব্যাখ্যায় ফলের আশা এই কারণেই বৃথা, কারণ ইহজীবনের যা কিছু পাওয়া সবই প্রারব্ধ কর্মকে ইঙ্গিত করে। তাই যে ফল আমার হাতে নয়, তা ভোগের আশা বৃথা। তাই বলা হয়েছে কর্মেতেই অধিকার ফলে নয়।

কবি বাল্যবিবাহ প্রচলনকে সমাজের সৎগতি রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার রূপে মনে করতেন, কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের ফলে পরবর্তী জীবনে বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব দেখা যায় 'গল্পগুচ্ছ' এর 'ত্যাগ' শীর্ষক গল্পে। তাছাড়া নিজ পুত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর বিবাহ দেন এটা সেই নারী জাগরণেরই নামান্তর, যা রবীন্দ্রনাথ বেদান্তের দ্বারাই শিখেছিলেন।

যখন জগতের কোন কিছুই আমার নয়, তখন তার ভোগের আশা বৃথা, বড়ো লোকের দাসীর ন্যায় নিষ্কাম কর্মের উপাসনাও বেদান্তের কর্মযোগের মূল কথা। কবির ভাষায়- "ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাতেই হয়, তবে ফল ধরে ; ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়।"[10] মরীচিকার জলে কখনো তৃষ্ণা মেটে না, তাই জগতে যা কিছু সুন্দর, ভালো, সবেতেই ভোগের ইঙ্গিত আছে কিন্তু তাহাতে কর্তৃত্ববুদ্ধি না রেখে ভোগ। ভোগে কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকলে তা আর ভোগ হয় না, কারণ কর্তৃত্ববুদ্ধি তা থেকে অহংকার জন্মে। সন্ন্যাসীর ভাষায় –

> *"জগৎটা আমার জন্য, আমি কখনও জগতের জন্য নই। ভাল-মন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব - উন্নতি করা নয়, বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা ; মানুষের স্বভাব - মন্দ ত্যাগ ক'রে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব --ভাল-মন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না, সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হ'তে হবে।"*[11] *সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে নিষ্কামকর্মে আত্মনিয়োগ করা ব্যাবহারিক বেদান্তের আরও একটি দিক।*

বর্তমান সমাজব্যবস্থা নেতিবাচক মানসিকতায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ, বিপর্যস্ত, যেখানে কুসংস্কার, পাপবোধ মানুষকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। জীবনের ইতিবাচক দিকগুলিও তাঁদের নেতিবাচক মানসিকতার কাছে হার মানে। ভাগ্যবান হয়েও

---

[8] কঃ উঃ- ১/৩/১৪

[9] স্বামীজির বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ.১৭৭-৭৮

[10] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ততঃ কিম্, ধর্ম, পৃ.১৪৩

[11] স্বামীজির বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৬৪

তাঁদের মানসিকতা দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত। এমত অবস্থায় রবি- বিবেকের প্রায়োগিক বেদান্তব্যাখ্যা হয়তো তাঁদের জীবনে আলোর প্রদীপ জ্বালাতে পারে। স্বামীজির ভাষায় বলা যায়-

> *"বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এইঃ নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা ; এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না।"*[12]

যেখানে আমরা নিজেকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী, সেখানেই আমরা বিজয়ী, নিজের মধ্যে বেদান্তের সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, যে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, যে ব্রহ্ম- "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"[13] সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই যখন জীবনের পাপ-পুণ্যের হিসাব মিলে যায়। তাই বেদান্তের বাণী জীবকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে ঝেড়ে ফেলে আলোয় উত্তরণের কথা বলে,- "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ! সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় - সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায়।"[14] সুতরাং বেদান্ত জীবকে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখায়, যা রবীন্দ্রনাথের ব্যাবহারিক বেদান্তেব্যাখ্যার অন্য একটি রূপ। তাছাড়া মহর্ষির হাত ধরে ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে চিনলেও রবীন্দ্রমননে তার স্বরূপ ভিন্ন ঢঙে প্রকাশিত। ব্রহ্মময় জগতের সবকিছুই তাঁর কাছে আনন্দস্বরূপ, উপনিষদ্ ঋষির "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"[15] যেন রবীন্দ্রনাথের মনের মানুষকে খোঁজার চাবিকাঠিন। রূপ-রস-গন্ধে ভরা জগতকে স্বীকার করে নিয়েই সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজেছেন তিনি আনন্দতত্ত্বের মধ্য দিয়ে।

সেই আনন্দের পথ ধরেই উপনিষদ্ ঋষিরা পরমপুরুষের খোঁজ পেয়েছেন, সেই আনন্দের হাত ধরেই কবি সুখ-দুঃখের যন্ত্রণা ভুলে চেতনার 'আমি'কে খুঁজে পেয়েছেন। যে আমি তাঁকে পরম শান্তি দিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, আবার সেই 'আমি' হাত ধরেই তিনি মুক্তির দিশা দেখিয়েছেন। তাই তাঁর লেখনীতে বৈরাগ্য বা আত্মোতত্ত্ববোধের মধ্য দিয়ে সমাজের যান্ত্রিকতা ভাঙার ইঙ্গিত 'মুক্তধারা' নাটকে অভিজিৎ চরিত্রে মধ্যে, তেমনি বেদান্তের আনন্দলোকে বদ্ধ আত্মার মুক্ত হওয়ার প্রবণতাও 'রক্তকরবী'তে আভাসিত। রসনন্দন কবি বাস্তবজীবনে আনন্দবোধের মধ্য দিয়ে বৈদান্তিক আনন্দলোকে পৌঁছানোর পথ খুঁজেছেন, এই সিদ্ধান্ত কি ফলিত বেদান্তের প্রমাণ নয়? এই প্রশ্ন রেখেই আমরা দেখব সন্ন্যাসীর আনন্দ খোঁজার পদ্ধতি।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদান্তিক আনন্দ খুঁজেছেন কর্ম রহস্যের মধ্য দিয়ে, মাত্র ঊনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন বয়সে একজন তরুণ যুবক কর্মকৌশলের যে রহস্য উন্মোচন করলেন, তা বেদান্ততত্ত্বের ঊর্দ্ধে। যে কর্ম রহস্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করিয়াছিলেন-

> *"প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান আর সবই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ-স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে, কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক না বহুত্ববিধায়ক। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে ঐগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে ঐগুলি সৎকর্ম বলিয়া জানিবে।"*[16]

এই প্রেমানন্দের আস্বাদ পেয়ে তিনি সমাজের সমাজকল্যাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ঘটিয়েছিলেন সমাজের ইস্পাতের মতো তরুণদের মনে মানসিক বিপ্লব, আবার সমাজের নীচু তলার মানুষদের ভাই বলে সম্বোধন করে

---

12 স্বামীজির বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৭১

13 কঃ উঃ -২/৩/১২

14 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ, ১

15 মুঃ উঃ -২/২/৭

16 স্বামীজির বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৭৮

বেদান্তের সেই 'আমি'কেই খুঁজেছিলেন, যে আমি জন্ম-জন্মান্তরের সাক্ষ্য বহন করে, যে আমি তাঁকে শিখিয়েছিল "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[17] সুতরাং প্রেমের পথেই জীবন লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে রসদ খুঁজে পেয়েছেন সন্ন্যাসী তা প্রয়োগিক বেদান্তের অন্যতম রূপ। তাছাড়া অন্তররাজ্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতাবোধকে জাগ্রত করার ডাক দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী। উপনিষদের 'অভি' মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসী-

> *"বেদান্তের ধর্মচিন্তা হৃদয়কে উদার করে, জাতির বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিভেদের মধ্যে একতা স্থাপন করে, যা ভারতীয় সনাতন ধর্ম চেতনার মার্মিক কথা। এক অখণ্ড মানবতাবোধ জাতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিদ্যমান। এরূপ মানবতাবোধই প্রকৃত ধর্মবোধ- যার থেকে উদ্ভূত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তি—এটিই হল বেদান্তভিত্তিক ধর্মনীতি ভাবনার মূল রহস্যতন্ত্র।"*[18]

এহেন ধর্মকে সাধনায় রূপান্তরিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ বেদান্তের আধ্যাত্মিকতত্ত্বকে যেভাবে জীবনের প্রতিটি চিন্তাভাবনার সঙ্গে যোগ করে তাকে প্রায়োগিক রূপ দিয়েছিলেন, বা সমাজকল্যাণের প্রতিটি পদক্ষেপে যেভাবে বেদান্তের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছিলে, তাকে ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত ছাড়া আর কি বলা যায়?

পরিশেষে বলি যতই আমরা বেদান্তকে কর্মজীবনে বা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর কথা বলি না কেন? যতই বেদান্তের অদ্বয়ভাবকে জীবনের পথে কাজে লাগানোর কথা বলি না কেন? বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য যে অখণ্ডতত্ত্ব তা জীবনতত্ত্বের অনেক উর্ধ্বে। বেদান্তের আদর্শ আর বাস্তবের আদর্শের মধ্যে ফারাক অনেক। তাই সত্যিই কি বেদান্তের চরম আধ্যাত্মিকতত্ত্বকে প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগানো সম্ভব? একথা বলার পরও বলতে বাধা নেই যে, প্রশ্ন যাই উঠুক না কেন? বা উপনিষদ্ যে কালেই রচিত হোক না কেন? উপনিষদের নৈতিক দর্শন নৈরাশ্যবাদী নয়, আনন্দবাদী। আনন্দের পথ ধরেই উপনিষদ্ আত্মতত্ত্বকে জানতে শেখায়। ধআত্মতত্ত্বকে জানতে শযে শিক্ষায় মানবজীবন সন্ধান পায় সত্য শিব সুন্দরের। মানবহৃদয়ের শাশ্বত বিবেকবোধ উদার মানসিকতা বেদান্তের -''ব্রহ্মাস্বাদসহোদর"এর সাক্ষাৎ দেয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ চিন্তার পথে এক চরম সত্যের খোঁজ করেছেন, উপনিষদ্ঋষির হিরণ্ময় পাত্রের উন্মোচনে যে সত্য প্রকাশিত, যে সত্যের প্রকাশেই কবি অনুভব করেন-

*"তোমার-আমার অসীম মিলন*
*যে গো সকল খানে।"*[19]

এই সত্য জাতি ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে এক অজানা অনুভূতিলোকে বিরাজ করে, যেখানে কবি সন্ন্যাসীর ফারাক থাকে না। মানুষই দেবতার আসন দখল করে। তাঁদের বেদান্তব্যাখ্যায় উপনিষদের চরম আধ্যাত্মিকতত্ত্ব নৈতিক দর্শনে পরিণত হয়ে জীবনের প্রতিটি কর্মকে সার্থক করে। এটাই বেদান্তের অন্যতম কার্যকারী রূপ।

---

17 স্বামীজির বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ২১০

18 দ্রঃ সংস্কৃত বিভাগীয়া গবেষণা পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৮

19 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, পৃ. ১৩

## অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জী

### মূলগ্রন্থ

**বাংলা সংস্করণ** :


1. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০, পরবর্তী সংস্করণ, ১৪১৭
2. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৪, ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫
3. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ), স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৫, ১৮তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১২
4. গীতাঞ্জলি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯
5. ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬ ২০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১০
6. বেদান্তপরিভাষা, করুণাসিন্ধু দাস সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৫, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০৪
7. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ (সমগ্র খণ্ড), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১
8. মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮
9. শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ-১৪০১
10. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪, ৩৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫
11. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৪, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩


### সহায়ক গ্রন্থাবলী

**বাংলা সংস্করণ** :


1. অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬
2. ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০
3. দত্ত, ভবতোষ, বাঙালী মানসে বেদান্ত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬
4. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, উপনিষদের পঠভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২

5. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০
6. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক), বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১২৯৮

1. अद्वैतसिद्धिः, अनन्तकृष्णशास्त्रणा सम्पादितः, पाडुरङ्ग, जावजी इत्येतैः प्रकाशितः, प्रकाशकालः – 1937
2. शव्दकल्पद्रुमः (प्रथम-खण्डः), स्यार राजा राधाकान्त देवः (सम्पादकः), मोतीलाल, वेनारसी दास, दिल्ली, प्रकाशकालः, अनुल्लिखितः
3. सहायक ग्रन्थ
4. औल्डेन वर्ग, प्राचीन भारतीय भाषा ओर धर्म, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1672
5. त्रिवेदी, राजेन्द्रकुमार, उपनिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति, परिमल पावलिकेशनस्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1693

**পত্র-পত্রিকা :**

1. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১১৬ তম সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
2. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
3. দৈনিক স্টেটম্যান, (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা) কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
4. সংস্কৃত বিভাগীয়া গবেষণা পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০১০